করোনা অতিমারি - লকডাউন - প্রান্তপারের মানুষ

'যমালয়ে বুঝি এইরূপ চির নির্মম এবং চিরান্ধকার। সেখানে কিছুই দেখিবার নাই, শুনিবার নাই,
কাজ করিবার নাই, কেবল চিরকাল এইরূপ জাগিয়া উঠিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে।'

[*'জীবিত ও মৃত' – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*]

অদ্ভুত মিল আজকে এই করোনা আবহাওয়ায় রবীন্দ্রনাথের যমালয়ের বিবরণ। সত্যিই আমাদের কিছু করার নেই। চার-পাঁচ মাসের গৃহবন্দী জীবন কী ভয়ানক হতে পারে সাধারণ মানুষের জানা ছিল না। তারা ভাবতেও পারে নি। কোভিড-১৯ বা করোনা অতিমারি অসংখ্য মানুষের জীবন ও জীবিকা কেড়ে নিয়েছে। কেড়ে নিচ্ছে মানুষের সুস্থ মন। অবসাদ, আত্মহত্যা, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা মনকে উথাল পাথাল করে তুলেছে। কম আয়ের মানুষ, খুচরো ছোট ব্যবসায়ীরা কী ভবে বেঁচে আছেন এই জীবন সংগ্রামে একটু জানার ইচ্ছেতে টুঁ মেরেছিলাম তাদেরই দ্বারে।

কী ভয়ানক যুদ্ধ তাঁরা চালিয়ে যাচ্ছেন ভাবলে অবাক হতে হয়। ভাইরাসের সঙ্গে যুদ্ধ মানে ছায়ার সঙ্গে লড়াই। হয়ত এই জীবন-যুদ্ধে মানুষ জিতবে কিন্তু কত জীবন-জীবিকার বিনিময়ে তা জানা যাবে না। যেমন জানা ছিল না পরিযায়ী শ্রমিকদের কথা।

আমাদের দেশে এখন প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষের নিশ্চিন্ত বসবাসের উপযুক্ত ঘরদোর নেই। নেই পানীয় জলের ব্যবস্থা। শুধু রেশনে বিনামূল্যে চাল-গম দিলে সরকারের দায়-দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। কেনই বা স্বাধীনতার ৭৪ বছর পরও সাধারণ মানুষ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান, খাদ্য ও পানীয় জলের জন্য সরকার বা সরকারি দলের কাছে ভিক্ষাবৃত্তি করবে? এ তো মানুষের সাংবিধানিক অধিকার। এ অধিকার যারা হরণ করে তারা অপরাধী। তারা দাতা নয়, ত্রাতা নয়– তারা হন্তারক। মুখোশের আড়ালে রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের অভিসন্ধি আজ প্রকট চেহারায় উপস্থিত হচ্ছে। রাজনৈতিক ক্ষমতাবান দল-গোষ্ঠী এই করোনা অতিমারিকে কাজে লাগিয়ে কেড়ে নিচ্ছে মানুষের জল-জমি-জঙ্গলের অধিকার।

প্রকৃত অর্থে আমরা বাস করছি অঘোষিত জরুরী অবস্থায়। পার্লামেন্ট নিষ্ক্রিয় – সরকার সক্রিয়। গণতন্ত্র ধর্মতন্ত্রে অবগাহন করেছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী আত্মসমর্পন করেছেন ধর্মীয় ভাবাবেগের কাছে। প্রকৃত অর্থে আজ বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদছে।

অন্যদিকে সাধারণ মানুষ ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য নিরন্তর মরণপণ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। একটা সামান্য হিসেব কষছিলাম। এটা তো আমাদের সবারই জানা, রেল স্টেশন বা প্লাটফর্মে বসে যারা হকারি করেন তাদের এই চার-পাঁচ মাসে কি করুণ অবস্থা হলো। পূর্বরেলের শহরতলী স্টেশনের সংখ্যা ৩৯৮টি। প্রত্যেকটি স্টেশনে ন্যূনতম গড়ে কুড়ি জন হকার ব্যবসায়ী যদি ধরা হয় তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৯৬০ জন। তারা এই গৃহবন্দী জীবনে কোথায় গেলেন? তাদের জীবন-জীবিকার কি ভয়ানক পরিণতি হলো আমরা জানি না। এদের প্রত্যেককে

কোনো না কোনো একটি রাজনৈতিক সংগঠনের ছাতার তলায় থাকতে হয়। সেই রাজনৈতিক দল বা দলের ট্রেড ইউনিয়নগুলো তাদের জন্য কি ব্যবস্থা নিল আমাদের জানা নেই। জানা নেই করোনা-পরবর্তী সময়ে তারা আর স্টেশনে হকারি করতে বা দোকান খুলতে পারবেন কি না। কেননা ইতিমধ্যে রেল স্টেশনগুলোকে বেসরকারি হাতে তুলে দেবার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। শোনা যাচ্ছে রেল তার স্টেশন সংলগ্ন জমিও বেসরকারিকরণ করে বেচে দেবে। রেলকে ঘিরে বহু মানুষের জীবন-জীবিকা বিপন্ন হবে তা নিশ্চিত করে বলা যায়।

এই লকডাউন বা করোনা অতিমারির সময়ে আঞ্চলিক এক সমীক্ষায় উদ্যোগী হই। ছোট ব্যবসায়ী বা ছোট পুঁজির দোকানীরা, অটো চালকেরা কি ভাবে দিন গুজরান করছে এই দুঃসময়ে তা জানার জন্য। আমার সমীক্ষার অঞ্চল ছিল সুভাষগ্রাম রেল স্টেশন সংলগ্ন অঞ্চল ও সুভাষগ্রাম পৌর বাজার। বেশ কিছু দোকানী, অটোচালক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলে জানার চেষ্টা করি তারা কিভাবে তাদের জীবন-জীবিকাকে রক্ষা করছে।

সমীর ঘোষ – জন সংযোগ কেন্দ্র। সুভাষগ্রাম পৌর বাজার লাগোয়া দোকান। ১৯৯৪ সাল থেকে বই-খাতার দোকান চালাচ্ছেন। চারজনের সংসার। স্ত্রী সরকারি চাকুরে। সমীর ঘোষ জানালেন, 'স্ত্রীর চাকরিটা ছিলো বলে এ যাত্রায় বেঁচে গেলাম। তা না হলে, দাদা, পথে বসতে হতো। নয়তো সরকারি দলের কাছে ভিক্ষা চেয়ে সংসার চালাতে হতো। ১২০ দিন বাজার সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল'।

মদন মন্ডল – খুচরো ফল ব্যবসায়ী। সুভাষগ্রাম স্টেশন সংলগ্ন রাস্তার ধারে দোকান। চল্লিশ বছর ধরে ফল বিক্রি করছেন। তিনজনের সংসার এই ব্যবসার আয়ে চলে। 'মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছি। লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনে মথুরাপুরে বাড়ি। এতদিন সুভাষগ্রামে ঘর ভাড়া করে বসবাস করছিলাম। লক ডাউনে ব্যবসা বন্ধ। ঘরভাড়া দিতে না পারায় দেশের বাড়ি চলে যাই। লোকাল ট্রেন বন্ধ। মথুরাপুর থেকে প্রতিদিন এসে ব্যবসা চালানো সম্ভব হচ্ছে না'। মদন মন্ডল জানালেন, 'ব্যবসা করে হাজার দশেক টাকা জমিয়েছিলাম – সেই টাকা দিয়ে এতদিন টেনে নিয়ে গেলাম। জানি না কিভাবে বাঁচবো; মেয়েটার লেখাপড়ার খরচ চালাবো'।

মুখোশের আড়ালে মদনের বিপন্নতা ঢাকা গেল না।

মুকেশ রাম – বিহারের সমস্তিপুরের বাসিন্দা। ১৯৮৩ সাল থেকে সুভাষগ্রাম স্টেশন সংলগ্ন জুতো সেলাইয়ের দোকান। 'করোনা অতিমারির আগে দৈনিক ২০০-২৫০ টাকা রোজগার ছিল। ৯০ দিন টানা বন্ধ থাকায় আয় শূণ্যতে এসে ঠেকেছে। দেশের বাড়িতে কিছুই পাঠাতে পারিনি। বৌ ধাই-এর কাজ করে বলে দেশের সংসার সেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কি এখানে পুরনো খদ্দেররা খুব ভালো। উপযাচক হয়েই বেশ কিছু মানুষ আমাকে কিছু অর্থ সাহায্য করে যাচ্ছে যার জন্যে প্রতিদিনের হাত খরচ চালিয়ে যেতে পারছি'।

অশোক বিশ্বাস – সুভাষগ্রাম রেল গেট সংলগ্ন সাইবার কাফে ও ছবি তোলার দোকান। ২৭ বছরের ব্যবসা। মোটামুটি চলছিল। ব্যবসার একটা মোটা আয় আসত ফটোগ্রাফি ও বিয়েবাড়ির ভিডিও ছবি তুলে। লক-ডাউনে বিয়ে বন্ধ। আয়ও বন্ধ। অশোক জানালেন – 'মার পেনশনটা ছিল বলে এ যাত্রায় বেঁচে গেলাম। জানি না অন্যেরা, যাদের একক আয়ের ওপর ভরসা, তারা কিভাবে সংসার চালাচ্ছেন। বড় বিপদ দাদা।'

রাজেশ ঘোষ – অটো চালক। সুভাষগ্রাম রেল গেট থেকে হরিনাভি-হরহরিতলার রুট। অটোর আয় থেকে এতদিন সংসার চলত। চার জনের সংসার। মেয়েটি ক্লাস ফাইভে লায়ন্স স্কুলে পড়াশোনা করে। তাকে প্রশ্ন করেছিলাম এই লকডাউনে কেমন করে সামলাচ্ছেন সংসার? উত্তরে রাজেশ বললেন – 'লক ডাউনের ঠিক আগে 'ওলা-উবের' গাড়ি চালাতে শুরু করি। নিজের বাড়ি আছে। ফলে খুব একটা অসুবিধায় পড়ি নি। তবে আমাদের লাইনে অনেক অটোচালক বন্ধুদের অবস্থা খুব শোচনীয়। প্রথম তিন মাস অটো চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকায় দৈনিক আয় শূণ্যে এসে দাঁড়ায়। সঙ্গে আমপান ঝড়ে অনেকের ঘরদোর ভেঙ্গে দুর্দশা আরো চরমে ঠেকেছে। ব্যক্তিগত কিছু সাহায্য ছাড়া আমরা তো কিছুই করতে পারি নি। বাচ্চাদের মুখের দিকে তাকানো যায় না। শুধু রেশনে চাল-ডাল দিলে তো আর হয় না, সংসার চালাতে নগদ টাকা দরকার। সেটারই অভাব। সবার বাড়িতে ওষুধ, কাঁচা সবজি দরকার। যাদের বাড়িতে শিশুরা আছে, তাদের পুষ্টিকর খাবার কোথার থেকে আসবে? কিভাবে কিনবে? রেশনের চাল বাজারে বিক্রি করে নগদ টাকা জোগাড় করছে'।

পলাশ পাল – চাল ব্যবসায়ী। সুভাষগ্রাম রেল গেট সংলগ্ন দোকান। তরতাজা যুবক। উদ্যমী। চালের ব্যবসার সাথে ১৫-২০টা পথকুকুরের দৈনিক খাবারের জোগান দেয়। আমপান ঝড়ের পর সুন্দরবনের একটি গ্রামে ত্রাণ নিয়ে হাজির হয়েছিল। পলাশকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম করোনায় ব্যবসার কি হাল দাঁড়ালো? সোজা-সাপ্টা উত্তর দিল – 'সত্যি বলতে কি দাদা, প্রথম তিন মাস অর্থাৎ করোনার প্রথম পর্বে চুটিয়ে ব্যবসা করেছি। দ্বিতীয় পর্ব থেকে মানে যে দিন থেকে রেশনে বিনা মূল্যে সরকার চাল দিতে শুরু করল তখন থেকে বিক্রি-বাটায় একটু ঘাটতি শুরু হয়েছে। তবে চলে যাচ্ছে। তেমন অসুবিধায় পড়িনি। সঙ্গে স্যানিটাইজারের ব্যবসা শুরু করেছি'।

অন্নপূর্ণা – মধ্য তিরিশের ফুটফুটে মেয়ে। সাউথ সিটিতে এক ডাক্তার পরিবারের শিশুর দেখাশোনার কাজ করত। প্রতিদিন ভোরে ট্রেনে করে যাদবপুর স্টেশন, তারপর অটো করে আনোয়ার শা রোডের সাউথ সিটিতে পৌঁছানো। মাইনে ভালো। ভালো ভাবেই চলছিল চারজনের সংসার। সব ওলটপালট করে দিল করোনা অতিমারি ও লকডাউন। লোকাল ট্রেন বন্ধ। আয়ও বন্ধ। তাহলে চলছে কি করে, জিজ্ঞেস করলাম। 'পুরনো একটা ভ্যান রিক্সা কিনে মেরামত করে নিয়েছি। হাজার আটেক টাকা খরচ হয়। ভোরে বারুইপুর গিয়ে সবজি কিনে সুভাষগ্রাম বাজার, সুভাষগ্রাম রেল স্টেশন ঘুরে ঘুরে বিক্রি করি। ভীষণ কষ্ট। কখনো ভাবিনি এমন পরিস্থিতিকে পড়তে হবে। লড়ে যাচ্ছি। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ'।

পবন মুখোপাধ্যায়
কলকাতা, অগাস্ট ২৭, ২০২০

যোগাযোগ : 9831172060
nagarikmancha@gmail.com